॥ ২ ॥

গল্প লেখার গল্প

কলেজ থেকে সবে বেরিয়ে একটি পল্লীগ্রামের হাইস্কুলে মাস্টারি নিয়ে গিয়েছি। কলকাতার কাছে বেশ বড় একটি গ্রামে। কাউকে চিনি না সেখানে। এক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে থাকি, একাই থাকি। সারাদিন বাইরের ঘরে বসে আপন মনে ভাবি, এখন কি একটা ছুটি চলছে, স্কুল খোলেনি।

একদিন দেখি একটি ষোলো সতেরো বছরের ছেলে একখানি বই হাতে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমি ডাকলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তার হাতের বইখানি কি, তাই জানা। ছেলেটিকে বল্লাম—কি বই হে? সে বল্লে সুরেন ভটচার্যের বই। সে যুগে সুরেন ভট্টাচার্যের বড় আদর ছিল। লাইব্রেরী চলতো না সুরেন ভট্টাচার্যের বই ছাড়া। আমি বল্লাম—কোথায় পেলে বই ? সে বল্লে—কাছেই রিপন লাইব্রেরী। ওখান থেকে বই নিয়ে আসি। আমার মনে হোল, এ তো বেশ। এখানে লাইব্রেরী আছে, সে খবর কেউ দেয়নি। বই যদি পড়তে পারি, নির্জনবাসের দুঃখ অনেকটা ঘোচে। ছেলেটিকে সে কথা বলতে সে তখনি রাজি হোল আমাকে লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিতে।

সেই দিনটি থেকে ছেলেটি আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে রোজ যায়। ওই একটি মাত্র সঙ্গী আমার জুটেছিল সেই সঙ্গীহীন দিনগুলিতে। স্কুল থেকে ফিরে এসে তার উপস্থিতির অপেক্ষায় বসে থাকতাম। সে এলে দুজনে গল্প করতাম, লাইব্রেরীতে বই আনতে যেতাম। ছেলেটির নাম পাঁচুগোপাল। সে একদিন আমায় বল্লে—জানেন আমাকে এখানে সকলে বালককবি বলে ? আমি বল্লাম—কেন ? সে সগর্বে বল্লে—আমি কবিতা লিখি যে ! তা ছাপানোও হয়েচে। আমাদের গ্রামে একখানা মাসিক পত্রিকা বার হয়েছিল একবার, তাতেই ছাপা হয়েছিল। বিকেলে ছেলেটি কাগজখানা নিয়েও এল, পল্লীযুবকদের উৎসাহ এবং তাদের নিরীহ অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থের কিয়দংশ ব্যয়ে 'বিশ্ব' নামক এই মাসিক পত্রিকাটি ছাপানো হয়েছিল—সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সেই পত্রিকাটিতে পাঁচুগোপালের একটি কবিতা একেবারে গোড়ার দিকে ছাপানো হায়েচে, যতদূর সম্ভব মনে হচ্চে কবিতার নাম 'মানব'। পাঁচুগোপালের ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়ে গেল, আমি নিজে তখন লিখি না বা কোনদিন লেখক হওয়ার স্বপ্নও দেখি না। গোপনে দু' একবার কবিতা লেখার চেষ্টা করেও দেখেছি, মনের মত হয়নি বলে ছেড়ে দিয়েছি। বন্ধুবান্ধব বা পাড়া প্রতিবেশীদের বিবাহে ছন্দহীন কবিতা যে একেবারে না লিখেছি তা নয়। কিন্তু অত অল্পবয়সে নয়। পাঁচুগোপালকে সমীহ করে চলি, কারণ আমার চেয়ে তার হাত অনেক ভাল কবিতা রচনায়।

দুজনে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করি সন্ধ্যাবেলা। একদিন সে বল্লে—আসুন, আমরা একটাকা দামের উপন্যাস বার করি। অনেক লাভ হবে। আমাদের গ্রামেই প্রেস আছে, অসুবিধে কিছু হবে না। আমি বল্লাম—তুমি লিখতে পারো কিন্তু আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। আমি কোনোদিন লিখিনি। পাঁচুগোপাল উৎসাহ দিয়ে বল্লে—ও আপনি খুব পারবেন, একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এমন সুরে বল্লে যেন উপন্যাস লেখাটা সাইকেল চড়তে শিখবার মত ব্যাপার, একটু অভ্যেস করলেই যে কেউ শিখে নিতে পারে ! ওর কথার উত্তরে আমি কি বলেছিলাম না বলেছিলাম তা আজ মনে নেই, কিন্তু এর দু'দিন পরে স্কুলে গিয়ে দেখি দেওয়ালে, ব্ল্যাকবোর্ডে, সামনের নারকেল গাছের গায়ে সচিত্র ছাপানো কাগজ মারা, তাতে লেখা আছে :-

বাহির হইল ! বাহির হইল !! বাহির হইল !!!
এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
"চঞ্চলা"।

স্কুলের ছেলেরা ও শিক্ষকরা সবাই প্রশ্ন করতে লাগলো—এই যে মশাই, আপনি যে তলায় তলায় লেখক তা তো জানতাম না। 'চঞ্চলা' নামটি বেশ দিয়েছেন মশাই। তা একখানা বই দিন আমাদের। আমি তো অবাক। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না ; এ বইয়ের লেখক কে তাও জানি না। অথচ সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে !

বাড়ী ফিরে পাঁচুগোপালকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করলাম। এ কি ছেলেমানুষি বাপু ? নামে একেবারে কাগজ ছাপিয়ে দেওয়া ! কে বলেছিল 'চঞ্চলা' উপন্যাস আমি লিখবো ? 'চঞ্চলা' নামটিই বা পেলে কোথায় ? পাঁচগোপাল বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হোলো না। বিনীত হাস্যবিস্তার করে বল্লে—কেন, ওই তো বলেছিলেন চেষ্টা করবেন। তাতে কি ? লিখুন না বই। খারাপ জিনিস তো কিছু ছাপিয়ে দিইনি আপনার নামে ?

ছেলেমানুষের কথার কি জবাবই বা দেবো। চুপ করেই থাকি। এদিকে যত দিন যায়, স্কুলের সহকর্মী শিক্ষক ও ছাত্রদলের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে উঠতে হয়। কবে আমার বই বের হচ্চে ? স্কুলের লাইব্রেরীতে যেন একখণ্ড উপহার দিই। এদের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ভাবলুম, এক কাজ করা যাক না ? পাঁচুগোপালের বই ছাপা যা হবে, তা বুঝতেই পেরেচি। ও পয়সা পাবে কোথায় যে বই ছাপাবে ? আমি একটা খাতায় পাতা কুড়ি বাইশ কিছু লিখে রাখি না ? যে দেখতে চায় তাকে দেখিয়ে বলবো, আমি তো বই লিখেচি। পাঁচুগোপাল বই না ছাপালে আমি কি করবো ? মান বাঁচানো নিয়ে বিষয়।

তাই করি। কখনো জীবনে গল্প লিখিনি, গ্রাম্য মাঠের ধারে রেললাইন, তার ওপরে একটা সাঁকো, পেছনেই তালবন। একটা মজা পুকুর। মজা পুকুরপাড়ে ষষ্ঠীতলা, পল্লীনারীরা পুজো দিতে আসে। স্কুলের ছুটির পরে রোজ রোজ সেই রেললাইনের সাঁকোর ওপর বসে গল্পের প্লট ভাবি, একটু একটু করে লিখি। এতদিন পরে এখনো সেই নির্জন পল্লীপ্রান্তর, সেই পুকুরের পাড়ের ষষ্ঠীতলা, আকন্দফুলের কয়েকটি ঝাড় আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। যেখানে বসে বাণীদেবীর সাধনা করেছিলুম একদিন, প্রথম সাধনার সেই নির্জন আসনটি স্মৃতিপটে মুদ্রিত হয়ে আছে চিরদিন।

অতিকষ্টে গল্প লেখা শেষ করলাম। কিছুদিন গেল, একে ওকে পড়ে শোনাই। কেউ বলে ভালো হয়েছে, কেউ বলে মন্দ হয়নি। একদিন শখ হোলো গল্পটা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোনো কাগজে ছাপে কিনা চেষ্টা করলে কেমন হয় ? নিয়ে এলুম সেটা কলকাতায়, একটা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার অফিসে গল্পটা দিয়েও এলাম। তাঁরা বল্লেন, ঠিকানাটা রেখে যান, মনোনীত না হলে কিন্তু ফেরৎ পাঠানো হবে।

গ্রামে ফিরে গিয়ে ডাকপিয়নকে বলে দিলাম, যদি আমার নামে কোনো বুকপোস্ট আসে, তবে স্কুলে বিলি করো না বাপু। আমাকে বোলো, ডাকঘর থেকে নেবো গিয়ে।

একদিন সত্যিই ডাকপিয়ন বল্লে, আপনার নামে একটা কি এসেছে, বুকপোস্টের মত। আমি বল্লাম—ওসব কথা এখানে বোলো না, চলো ছুটির পরে ওখান থেকেই নেবো। মনে বড়ই দুঃখ হোল। এত চেষ্টা করে গল্পটা লিখলাম, ফেরৎ দিলে ওরা ?

ডাকঘর থেকে বুকপোস্টটা নিয়ে খুলে দেখি সেটা আমার গল্পই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের একখানা চিঠি। তাতে লেখা আছে, গল্পটি তাদের খুব ভাল লেগেছে, এ মাসেই তাঁরা ছাপতে চান, শেষের প্যারাতে একটু পরিবর্তন আবশ্যক, সেটা করে আমি যেন লেখাটা তাঁদের খুব শীঘ্র পাঠিয়ে দিই।

সেদিন সেই গ্রামে এমন একটি লোকও ছিল না, কোনো না কোনো ছুতোয় সেই পত্রখানা যাকে পড়ে শোনাইনি। জীবনের সেই প্রথম সাফল্য বাণীসাধনার, প্রথম যৌবন দিনের সে অপূর্ব উৎসাহ, বিপুল আনন্দের স্মৃতি আজও আমার মানসপটে অম্লান হয়ে আছে। সহকারী সম্পাদকের সামান্য একখানা চিঠি, সে যেন তখন আমার জীবনের পরম সম্পদ। পরবর্তী জীবনে অনেক বড় লাভের ও প্রশংসার বাণীতেও আমি আর সে ধরনের আনন্দ আস্বাদ করিনি। ধরার অরুণোদয়ের মত আমার জীবনে সেইদিনটি পরম পবিত্র, পরম পুণ্যময়। অন্য লোকের কাছে কোনো মূল্য নেই হয়তো, কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসে সেই সামান্য চিঠিখানি একটি অতি মূল্যবান দলিল।

আমার এই প্রথম ছোট গল্পটি হচ্ছে 'উপেক্ষিতা', আমার 'মেঘমল্লার' নামক ছোট গল্পের বইয়ের শেষের দিকে আছে।

[বেতারস্থ কথিকা। প্রচার ৯ জুন ১৯৪৫
সূত্র : জ্যোতিপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
গল্প লেখার গল্প।]